দাদা ভাই শিশুদের গড়তে ব্যয় করেছেন জীবন

সংশপ্তক হাসান

হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটি শিং

কিংবা

খোকন খোকন ডাক পাড়ি
খোকন গেল কার বাড়ি

এই ছড়াগুলো রাঙিয়ে দিয়েছে এদেশের কয়েক প্রজন্মের শৈশব। আজও লাইনগুলো চোখে পড়লেই মনে হয় হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে মায়ের কোলে বসে থাকা ছেলেবেলা। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে শৈশবের বনিবনা কারও কখনও ভালো ছিল না। কিন্তু এই ছড়াগুলোর ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম। পড়া বলে মনেই হতো না। কম মানুষই আছে যারা ছোটবেলায় এই ছড়াগুলো মাথা দোলাতে দোলাতে পড়েনি। কিন্তু কখনও কি মনে হয়েছে আমাদের শৈশব রাঙানো ওই ছড়াগুলোর রচিয়তা কে? তিনি রোকনুজ্জানান খান। সবাই যাকে চিনি কচিকাঁচার দাদা ভাই নামে।

দাদা ভাইয়ের কথা এলেই চলে আসে শিশু-কিশোরদের কথা। ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। কথাটি আমরা মুখে সবাই স্বীকার করলেও কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কমই করি। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন যারা এই কথাটিই জীবনের পাথেয় মেনে চলেন। তারা ব্যক্তিগত অর্জনের লোভে লোভী নন। আজকের শিশুকে আগামী দিনের সুনাগরিক করে গড়ে তোলাটাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য করে নেন। তাদেরই একজন এই দাদা ভাই। যার হাতের ছোঁয়ায় দেশের কয়েক প্রজন্মের শিশু হয়ে উঠেছে সৃজনশীল।

রোকনুজ্জামান দাদা ভাইয়ের জন্ম এমন একটি পরিবারে যে পরিবারের অনেকেই ছিলেন শিল্পচর্চার সঙ্গে জড়িত। তাদের কেউ কেউ আবার ছিলেন দেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। ১৯২৫ সালের ৮ এপ্রিল ফরিদপুরের পাংশায় নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন দাদা ভাই।

এপ্রিল ৮, ১৯২৫-ডিসেম্বর ৩, ১৯৯৯

সেকালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী ও এয়াকুব আলী চৌধুরী সম্পর্কে ছিলেন তার নানা। দাদা ভাইয়ের বাবার নাম মৌলভী মোখাইর উদ্দীন খান আর মায়ের নাম রাহেলা খাতুন। কিন্তু খুব বেশিদিন মায়ের আদর স্নেহ কপালে জোটেনি তার। শৈশবেই ঘটেছিল মাতৃবিয়োগ। তাই মা মরা দাদা ভাইকে তার নানা বাড়ির মানুষ আর বাবার বাড়ি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থানার ভবানীপুর গ্রামে পাঠাননি। নিজেরাই নিয়েছিলেন তার দেখাশেনার ভার। দাদা ভাইয়ের শিক্ষাজীবন শুরু হয় পাংশায়। স্কুলজীবন শেষ করেন পাংশা জর্জ স্কুল থেকে। এরপর তিনি কলকাতা চলে যান। কলকাতা গিয়ে পড়ালেখার পাশাপাশি তার ভেতরে জেগে ওঠে এক স্বাধীন সত্তা। নাম লেখান রাজনীতিতে। সেখানে মুকুল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিনি।

দাদাভাই তার কর্মজীবনের শুরু থেকেই শিশু-কিশোরদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। সেটি ছিল ইত্তেহাদ পত্রিকার মাধ্যমে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। ১৯৪৮ সালে ইত্তেহাদের 'মিতালী মজলিস' নামের শিশু বিভাগের দায়িত্ব পান তিনি। এরপর তিনি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন 'সওগাত' পত্রিকায়। এবার যেন তার কাজের পরিধি আরও বেড়ে যায়। পরে ১৯৫২ সালে 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকায় যোগ দেন তিনি। এখানেও কাজটা তার শিশু কিশোরদের নিয়েই ছিল। মিল্লাতের শিশু কিশোর বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন তিনি।

১৯৫৫ সালে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় তরুণ সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন দাদা ভাই।

দাদা ভাই নামটি এলেই চলে আসে কচিকাঁচার আসরের কথা। এই আসরই রোকনুজ্জামান খানকে বানিয়েছিল দাদা ভাই। সে অনেক আগের কথা। দাদা ভাই তখন তরুণ সাংবাদিক। চার বছর হলো ঢুকেছেন ইত্তেফাকে। এরই মধ্যে ১৯৫৬ সালে গঠন করেন শিশু-কিশোরদের সবচেয়ে বড় সংগঠন 'কচিকাঁচার আসর'। সে বছরের ২ এপ্রিল কচিকাঁচার আসরের পরিচালক নিযুক্ত হন তিনি। সেসময় ঠিক করা হয় এ আসরের পরিচালকের নাম দাদা ভাই। আর এভাবেই 'দাদা ভাই' নামের আড়ালে চাপা পড়ে যায় তার প্রকৃত নাম রোকনুজ্জামান খান।

কচিকাঁচার আসর ছিল মূলত শিশুদের মননশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম শিক্ষামূলক কার্যক্রম। পড়ুয়া করে তুলতে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করা হতো তাদের। এছাড়া সৃজনশীল সত্তা জাগিয়ে তুলতে নাচ, গানসহ বিভিন্ন সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখা হতো তাদের। প্রগতিশীল মানুষ গড়ার কারিগর ছিল কচিকাঁচার আসর। আর এসবের সঙ্গে দাদা ভাই ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার পরিচিতিতেই সমৃদ্ধির পথে একটু একটু করে এগিয়েছে সংগঠনটি। ষাটের দশকে কচিকাঁচার মেলার মুখপাত্র হিসেবে একটি পত্রিকা বের করা হয়। এই পত্রিকার নাম রাখা হয়েছিল 'কচিকাঁচা'।

কচিকাঁচা পত্রিকার জন্য লিখতেন সেসময়ের নাম করা সব লেখক-কবি। সুফিয়া কামাল, আব্দুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন, শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, ফয়েজ আহমেদ, হোসনে আরা, নাসির আলী, হাবীবুর রহমানসহ বিখ্যাত অনেক লেখকরা নিয়মিত লিখতেন এখানে। এছাড়া সেসময় দেশের প্রগতিশীল নাগরিকদের কেউ সরাসরি আবার কেউ আত্মিকভাবে যুক্ত ছিলেন কচিকাঁচার আসরের সঙ্গে। অনেকে তো আবার এ মেলার সদস্যও ছিলেন। এরমধ্যে সুলতানা কামাল, হাশেম খান, মাহবুব তালুকদার, কৌতুক অভিনেতা রবিউল অন্যতম। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সদস্য ছিলেন কচিকাঁচার। আর এসব সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র দাদাভাইয়ের কারণে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে সবাই ইত্তেফাকের কচিকাঁচার বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে ছিলেন নিয়মিত।

কচিকাঁচার মেলা নিয়ে দাদা ভাইয়ের চলার পথ খুব মসৃণ ছিল না। এ সংগঠনটি দাঁড় করাতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে থাকে। হাঁটতে হয়েছে কাটা বিছানো পথে। বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক শক্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে কচিকাঁচা আসর। নানা হুমকি-ধামকি ভয়ভীতি এসে চোখ রাঙিয়ে গেছে। যতবারই এরকম ঝড় উঠেছে ততবারই দাদা ভাই দাঁড়িয়েছেন ঢাল হয়ে। একটা আঁচড়ও লাগতে দেননি সংগঠনটির গায়ে। কচিকাঁচার আসরের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত আসে ১৯৭১ সালে। হায়নাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল এটি। পাকিস্তানি সেনাদের গোলার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মেলার কাকলি পাঠাগার। সেসময় অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন আর বোধ হয় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না এ আসর। কিন্তু দাদা ভাই ছিলেন দৃঢ়চেতা।

১৯৫৫ সালে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় তরুণ সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন দাদা ভাই।

১৯৫৬ সালে গঠন করেন শিশু-কিশোরদের সবচেয়ে বড় সংগঠন 'কচিকাঁচার আসর'।

২০০০ সালে বরেণ্য এই ব্যক্তিত্বকে ভূষিত করা হয় স্বাধীনতা পদকে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর সবার ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড় করান কচিকাঁচাদের প্রাণের ঠিকানাটিকে। এ সংগঠনটির ভিত আরও মজবুত হয়। এই সংগঠনটিকে একটানা ৪৪ বছর দাদা ভাই আগলে রেখেছিলেন নিজের অভিবাকত্বের ছায়ায়। ফলে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদীদের আস্থা ও আশ্রয়ের নাম হয়ে উঠতে সময় লাগেনি কচিকাঁচার আসরের। সেসময় প্রগতিশীল ও সৃজনশীল নাগরিকেরা তাদের সন্তানের মানসিক বিকাশের জন্য ভরসা করতেন কচিকাঁচার ওপর। কয়েক প্রজন্ম ধরে কচিকাঁচার আসরের পাঠ নেওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম নয়। এ আসর থেকে যত ছাত্রছাত্রী বেরিয়েছে তারা আজ দেশের বিভিন্ন অংগনে ছড়িয়ে আছেন। অবদান রাখছেন শিল্প-সংস্কৃতির নানা কর্মকাণ্ডে। কচিকাঁচার আসরের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি দাদা ভাইয়েরও ছিল অগাধ বিশ্বাস। তার একটি মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা। এ সংগঠন নিয়ে দাদা ভাই বলেছিলেন, কচিকাঁচার মেলার অনেক সদস্য মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু কেউ রাজাকার হননি। অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা নয়; মুক্ত দৃষ্টি, উদারতার শিক্ষা মেলার সদস্যরা পেয়েছিলেন বলে তারা পরবর্তী সময়ে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বাসঘাতকতার নয়।

বিজয় দিবসে কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার অনুষ্ঠানে ভাই-বোনদের সমবেত সংগীত পরিবেশন

দাদা ভাইয়ের কাজের পরিধি ছিল বিস্তৃত। কচিকাঁচা ছাড়াও আরও সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন সাংগঠনিক এই মানুষটি। তার প্রস্তাবেই গড়ে তোলা হয়েছিল শিশু একাডেমি। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি, শিশু একাডেমি, শিশু কল্যাণ পরিষদেরও দায়িত্বে ছিলেন তিনি। লেখক হিসেবেও দাদা ভাই ছিলেন অনবদ্য। তার একাধিক ছড়ার বই আছে। তার লেখা অনেক ছড়াই আমাদের শৈশবের ক্যানভাসে আচড় কেটেছে রঙ তুলি হয়ে। এরকম আরও একটি জনপ্রিয় ছড়া হলো:

বাক বাক্ কুম পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কাল কি
চড়বে সোনার পালকি

দাদা ভাইয়ের লেখা ছড়ার বই দুটি হচ্ছে: 'হাট্টিমাটিম টিম' ও 'খোকন খোকন ডাক পাড়ি'। এছাড়া একাধিক বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন তিনি।

দাদা ভাই তার জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন দেশের নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার কাজে। বাড়িয়েছেন বোধসম্পন্ন নাগরিকের সংখ্যা। শিশুদের কল্যাণে অসামান্য অবদান রাখায় তাকে দেওয়া হয়েছে একাধিক স্বীকৃতি। ২০০০ সালে বরেণ্য এই ব্যক্তিত্বকে ভূষিত করা হয় স্বাধীনতা পদকে। এছাড়া তিনি পেয়েছে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, শিশু একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, জসীমউদ্দীন স্বর্ণপদকসহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা।

দাদা ভাই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে ১৯৯৯ সালে ৩ ডিসেম্বর। এদিন অসংখ্য গুণগ্রাহী ও প্রাণের সংগঠন ফেলে রেখে চলে যান না ফেরার দেশে। ৮ এপ্রিল বরেণ্য এই সংগঠক ও শিশু সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষের জন্মদিন। তার প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।